তপন সিংহ এবং
ফিচার ফিল্ম ম্যানেজমেন্ট

নীলাঞ্জন ভট্টাচার্য

চলচ্চিত্র পরিচালক তপন সিংহ সদ্যপ্রয়াত। তাঁর বৈচিত্র্যময় চলচ্চিত্র-সম্ভারের মূল্যায়ন তাঁর জীবৎকালেও হয়েছে এবং তাঁর প্রয়াণের পর আবারো হচ্ছে। আশা করা যায়, ভবিষ্যতেও এই চর্চা চালু থাকবে। তপন সিংহ-র মননশীল অথচ আশ্চর্য-সহজ ছবিগুলির মূল্যায়ন তো জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে হয়েই গেছে। যখন তাঁর ছবিগুলি টেলিভিশনে দেখানো হয় বা ডিভিডিতে পৌঁছে যায় সাধারণ দর্শকের কাছে তখন আবার তিনি সমাদৃত হন, এই নতুন সময়েও!

এই প্রবন্ধে তপন সিংহ-র ছবির মূল্যায়ন করার চেষ্টা আমি করবো না। বরঞ্চ তাঁর সাথে সহকারী পরিচালক হিসাবে কিছুদিন কাজ করার অভিজ্ঞতায় কাছ থেকে দেখা, শোনা, কিছুটা শেখা, তাঁর কাজ করার পদ্ধতি ও আবহ এখানে লিখবার চেষ্টা করবো।

টালিগঞ্জ ফিল্ম স্টুডিও এবং তার ঐতিহ্য আমাদের গর্বিত করে। যদিও এখন সেই ঐতিহ্যের সূচক হয়ে রয়ে গেছে কয়েকটা পুরনো গথিক শুটিং ফ্লোর, মেকাপ রুম, দেয়ালে টাঙানো কিছু ফ্যাকাশে হয়ে আসা কিছু ছবি। মেগাসিরিয়াল, বম্বে ও দক্ষিণী বাণিজ্যিক ধারা অনুসারী কাহিনীচিত্রের স্রোতে, কালের অমোঘ গতিতে, টালীগঞ্জ ফিল্ম সংস্কৃতি, যা বাংলা

চলচ্চিত্র সংস্কৃতিরই সমার্থক, এখন বিলুপ্ত। জানি ডিজিটাল আর শপিং মলের আবহে দাঁড়িয়ে পুরনো সময় নিয়ে আহা-উহু-বিলাপ করার কোনো মানে নেই। আবার পুরনো সংস্কৃতির যে আবহে আমি সমৃদ্ধ হয়েছি তকে অনন্য মনে করি। তপন সিংহ-র সঙ্গে কাজ করার সূত্রে সৌভাগ্যক্রমে সেই ঐতিহ্যময় আবহ ও কর্মপদ্ধতির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে।

চলচ্চিত্র নির্মাণে পরিচালকই শেষ কথা— আবার একইসঙ্গে এটাও সত্যি যে চলচ্চিত্র একটা কালেক্টিভ আর্ট ফর্ম। তপন সিংহকে দেখেছি অনায়াস দক্ষতায় এই দুটির মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে। আমি যেদিন সহকারী পরিচালক হিসাবে তাঁর ইউনিটে যোগ দিই উনি আমাকে বলেছিলেন— বলাই-এর (সহযোগী পরিচালক) কাছ থেকে ফিচার ফিল্ম ম্যানেজমেন্টটা শিখে নাও।

সেই মুহূর্তে বুঝতে পারিনি ফিচার ফিল্ম ম্যানেজমেন্ট বলতে উনি ঠিক কী বলতে চাইছেন। পরবর্তী সময়ে ওঁর ইউনিটে কাজ করতে করতে, ওঁকে দেখে এবং আরো পরে নিজে পরিচালনার কাজ করতে গিয়ে বুঝতে পেরেছি, চলচ্চিত্র সৃষ্টি, বিশেষত পরিচালনার ক্ষেত্রে, তা সে কাহিনীচিত্র হোক বা তথ্যচিত্র, ওই দক্ষতা কতটা জরুরী। এতগুলো লোক— কলাকুশলী, অভিনেতা, প্রযোজক; এতগুলো বিষয়— চিত্রনাট্য, আলো, সম্পাদনা, শব্দ, সঙ্গীত, সবার কাছ থেকে, সব বিভাগেই তো পরিচালক হিসাবে আপনি সেরাটা পেতে চাইবেন। তবেই না আপনার ছবির মান উঁচু হবে। সব বিভাগেরই দায়িত্বেই একজন করে থাকবেন কিন্তু পরিচালক হিসাবে আপনাকেই নিশ্চিত করতে হবে যে আপনি তার কাছ থেকে সেরাটা পাবেন। আর তা পেতে গেলে পরিচালককেই সেই দায়িত্বপ্রাপ্ত মানুষগুলির আস্থা অর্জন করতে হবে, অনুপ্রাণিত করতে হবে তাদের। তবেই না তারা তাদের সেরাটা আপনাকে দেবেন। তপন সিংহকে দেখেছি সাবলীলতার সঙ্গে ঠিক এই কাজটিই করতে। তাঁর সৃষ্টিশীলতার পাশাপাশি এই ম্যানেজমেন্ট-দক্ষতাই তপন সিংহকে এত লম্বা সময় ধরে সফলভাবে কাজ করে যেতে সাহায্য করেছে বলে আমার ধারণা।

তপন সিংহর স্ক্রিপ্ট রিডিং সেশনে থাকার অনন্য অভিজ্ঞতা এখানে লিখবার লোভ সামলাতে পারছি না। হয়তো বোঝাতে পারবো, কি সূক্ষ্মতায় একজন পরিচালক তাঁর সৃজনশীলতা, আবেগ চারিয়ে দিতে পারেন অভিনেতাদের মধ্যে! *হুইল চেয়ার* ছবির চিত্রনাট্য পড়া হবে, তপন সিংহ-র ড্রইংরূমে জড়ো হয়েছেন ছবির মূল অভিনেতারা— সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র, নির্মলকুমার, অর্জুন চক্রবর্তী, লাবণী সরকার এবং কৌশিক সেন। তপন সিংহ জানিয়ে দিলেন কাকে কোন চরিত্র-র জন্যে নির্বাচন করেছেন। তারপরে পড়তে শুরু করলেন— হুইলচেয়ারে বসা, আংশিক-বিকলাঙ্গ, আদর্শবাদী, জেদী ও দুর্মুখ এক ডাক্তারের লড়াই তাঁর রুগীদের ভালো করে তোলার। ঘাড় থেকে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত বিকলাঙ্গ একটি যুবতী মেয়েকে স্বাভাবিক করে তোলার অমানুষিক এক যুদ্ধের কাহিনী।

তপন সিংহ পড়ে চলেছেন, উচ্চকিত স্বর নয় অথচ প্রতিটি চরিত্র সামনে যেন জেগে উঠছে ধীরে ধীরে, ঘোরাফেরা করছে। ড. মল্লিক যেন হুইল চেয়ার নিয়ে চলাফেরা করছেন হাসপাতালের ওয়ার্ডে। দেখতে পাচ্ছি বেডে শুয়ে থাকা রুগীদের, তাদের নড়াচড়া, হেঁটে যাওয়া— দেখতে পাচ্ছি দিনের পর দিন নিশ্চল হয়ে থাকা মেয়েটির পায়ের আঙ্গুল নড়ে ওঠার প্রথম মুহূর্ত ...!

মাঝখানে চা এসেছে, কিন্তু চিত্রনাট্য পড়া চলেছে টানা আড়াই ঘণ্টা! শেষ হওয়ার পর উপস্থিত সবার চোখমুখ দেখে বুঝতে পারি শুধু আমি নই, চরিত্রগুলির নড়াচড়া, কথাবার্তা, দৃশ্যের পর দৃশ্য, যেন দেখতে পেয়েছে সকলেই! ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানোর অনেক আগেই তপন সিংহ তাঁর ছবির চরিত্রগুলিকে স্থাপন করে ফেললেন অভিনেতাদের মধ্যে। পরে শুটিং-এর সময় তাঁকে কোন চরিত্র অভিনয় করে দেখাতে প্রায় কখনো দেখিনি। বরঞ্চ অভিনেতাদের বলতেন তাদের নিজেদের বোধ অনুযায়ী অভিনয় করতে। শট নেওয়ার আগে কখনো-সখনো নির্দিষ্ট কোনো চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, কোন ম্যানারিজম বা টিপিক্যালিটি

ধরিয়ে দিতেন সেই চরিত্রের অভিনেতাকে। অভিনেতার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আর তাঁর অভিনীত চরিত্রটির বৈশিষ্ট্য মিলেমিশে অভিনীত চরিত্রটি পেত অন্য এক মাত্রা। এমনকি সাধারণ মাপের অভিনেতারও তাই তপন সিংহ-র ছবিতে তাঁদের অভিনীত চরিত্রগুলিকে স্বাভাবিকতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা দিতে পেরেছেন।

একইসঙ্গে একজন অভিনেতাকে স্বাধীনভাবে চরিত্রায়ন করতে দেওয়া এবং অভিনীত চরিত্রটির জরুরী বৈশিষ্টগুলিকেও সেই অভিনেতার মাধ্যমেই রূপায়িত করা, আপাতবিরোধী এই দুটি কাজকে সুচারুভাবে সমাধা করা, তপন সিংহ-র পরিচালন দক্ষতার এক বিশেষ দিক।

কাছ থেকে দেখা, কতোটা সুসংবদ্ধ ছিলো তপন সিংহ-র কাজ করার পদ্ধতি। কিন্তু কখনোই তা শ্বাসরোধকারী শৃংখলা নয়। খুব স্বাভাবিক এক শৃংখলায় কাজ হতো। তার কারণ, প্রি-প্রোডাকশন স্তরেই সময় দেওয়া হতো অনেক বেশী এবং পুরো প্রোডাকশন পরিকল্পনাই ছকে নেওয়া হতো। এমন নয় যে পরিকল্পনার অদল-বদল হতো না। কিন্তু প্রাথমিক পরিকল্পনাতেই এই অদল-বদলের সম্ভাবনার কথা ভাবা থাকতো। তাই কোনো শুটিং সেডিউল বাতিল হওয়ায় পরিচালক বা ইউনিট সদস্যদের মাথায় হাত দিয়ে হা-হুতাশ করতে হয়নি কখনো। পরিকল্পিত বাজেটের থেকে অনেক বেশি খরচ করে ফেলে প্রযোজককে কিংবা নির্মীয়মান ছবির ভবিষ্যৎ বিপন্ন করে ফেলতে দেখিনি। বুঝতে পেরেছি এর পিছনে সঠিক সিডিউলিং কতোটা জরুরী। তপন সিংহ-র ইউনিটে সিডিউল বানাতেন চল্লিশ বছর ধরে ওঁর সাথে কাজ করে আসা বলাই সেন। ওদের দুজনের পারস্পরিক বোঝাপড়া ছিল যেন অন্তর্নিহিত। তপন সিংহের সাথে আমার কাজ করার অভিজ্ঞতায় শুটিং শিফটের এক্সটেনশন হতে দেখেছি মাত্র কয়েকটা দিন। সাধারণত ইনডোর শুটিং হলে শিফট শেষ হওয়ার আধঘণ্টা আগেই উনি প্যাক-আপ ঘোষণা করতেন! কারণ দিনের নির্ধারিত কাজ ওই সময়ের মধ্যেই হয়ে যেতো! অথচ কোনোদিনই দিনের কাজ শেষ করার জন্য প্রচণ্ড তাড়াহুড়ো করতে দেখিনি তপন সিংহকে। ক্যামেরাম্যানকে লাইট করার, মেকআপ ম্যানকে মেক-আপ করার, অভিনেতাকে

রিহার্সাল করার যথেষ্ট সময় দিতেন। প্রয়োজনমতো রি-টেক নিতে কার্পন্য করতেও দেখি নি। অনায়াস মসৃণ, ছন্দোময় গতিতে চলতো শুটিং। এই মসৃণতা তপন সিংহ-র ছবির সহজ সরল নিটোল গল্প বলাতে প্রতিফলিত হতো। বুঝতে পারি, কেন তিনি আমাকে ফিচার ফিল্ম ম্যানেজমেন্ট শিখে নেওয়ার কথা বলেছিলেন। বুঝতে পারি, ফিচার ফিল্মের ম্যানেজমেন্ট শুধুমাত্র প্রোডাকশন ম্যানেজার বা সহকারী পরিচালকেরই কাজ নয়, এর মূল নিয়ন্ত্রাও আসলে পরিচালকই!

তপন সিংহ-র এডিটিং সংক্রান্ত একটি ঘটনা এখানে প্রাসঙ্গিক হবে। *হুইল চেয়ার* ছবির এডিট চলছিলো ইমেজ ইন্ডিয়া স্টুডিওর মুভিওলা মেশিনে। তাঁর বহু ছবির এডিটর সুবোধ রায় তখন বয়স ও অসুস্থতার কারণে আর এডিট করতে পারেন না। তাই তপন সিংহ আর একজন অভিজ্ঞ এডিটর অরবিন্দ ভট্টাচার্যর সঙ্গে বসে এডিট করছিলেন। একটি নির্দিষ্ট দৃশ্যের এডিট কিছুতেই তপন সিংহ-র মনঃপূত হচ্ছিল না। অনেক চেষ্টা করেও যখন দৃশ্যটা তাঁর পছন্দসই হলো না তখন তিনি সেদিনের শিফট্ শেষ হওয়ার অনেক আগেই কাজ বন্ধ করে দিলেন। বলাই সেনকে ডেকে বললেন, ‘‘বলাই, কাল আসার সময় সুবোধকে বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে এসো, আমি সুবোধকে ফোন করে বলে দেবো।’’ তারপর এডিট রুম থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে অরবিন্দ ভট্টাচার্যের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘‘আমার মনে হয় সুবোধ গন্ডগোলটা ধরতে পারবে। ওর সেন্স অফ টাইমিং খুব ভালো।’’ তপন সিংহ বের হয়ে যেতেই বলাই সেনের স্বগতোক্তি, ‘‘হা, সুবোধদা মুভিওলাটা এহন চালাইতে পারবো কি না সন্দেহ, তায় আবার চোখে ঠিক কইর‍্যা দেখতে পায় না . . . ।’’ অশক্ত শরীর, চোখে প্রায় না-দেখতে পাওয়া সুবোধ রায়ের চেহারা মনে করে আমি মনে মনে বলাইদার সাথে সহমত না হয়ে পারলাম না।

যারা মুভিওলাতে এডিট করেছেন বা দেখেছেন তারা জানেন এটা যেন এক প্রাগৈতিহাসিক মিনি ডাইনোসর! মোটর সাউন্ড, পাশাপাশি চলা ফিল্ম স্ট্রিপ এবং সাউন্ড স্ট্রিপের শব্দ, ছোট

ঝাপসা মনিটরে চলন্ত ছবি, দেখা যায় কি যায় না ...! চলন্ত ফিল্ম স্ট্রিপ থামানোর জন্যে নীচে আছে প্যাডেল যা পায়ের চাপের ওঠানামায় নিয়ন্ত্রিত হয়। একটি নির্দিষ্ট ফ্রেমকে ধরার জন্য দরকার চোখ, হাত, পা আর মস্তিষ্কের অতি দ্রুত কো-অর্ডিনেশন! এমন একটা খটোমটো যন্ত্রের সামনে সুবোধ রায়কে নড়বড়ে শরীর নিয়ে বসতে দেখে আমার তাই বিশেষ ভরসা জাগলো না। আদৌ উনি মেশিনটা ঠিকমতো চালাতে পারবেন তো? সুবোধ রায় কিন্তু মেশিনটা চালালেন মসৃণভাবে, ফ্রেম ধরলেন সঠিক, মার্ক করলেন, দুটো কাট পয়েন্ট বদল করলেন, দৃশ্যটির সামান্য অংশ বাদ দিলেন— আধঘন্টায় তাঁর কাজ শেষ। নতুনভাবে এডিট করা দৃশ্যটি চালানো হলো, তপন সিংহ দেখলেন। ‘‘পারফেক্ট! এডিটিং ইজ অ্যাকচুয়ালি অল অ্যাবাউট টাইমিং’’— সুবোধ রায়ের দক্ষতার প্রশংসায় তাঁর স্বগতোক্তি।

এই ঘটনা আমাকে শিক্ষা দিলো কীভাবে একজন পরিচালক সংকটের সময় ইমপ্রোভাইস্ করতে পারেন, কীভাবে যতটুকু দরকার ততটুকু বের করে নিতে পারেন একজন টেকনিশিয়ানের কাছ থেকে। তপন সিংহ জানতেন কোন কাজটা কাকে দিয়ে সবথেকে ভালোভাবে করানো যাবে। চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে এও তাঁর এক বিশেষ ম্যানেজমেন্ট দক্ষতা।

একজন চলচ্চিত্র পরিচালককে তো তার ফিল্ম ইউনিট নামক বিশাল গাড়ীটার ‘চালক’ হতে হবে সত্যি অর্থেই। তিনি সেই গাড়ী যেমন চালাবেন তেমনি না চলবে সেটা। আপনি কলাকুশলী, শিল্পী বা প্রোডাকশন বয়— যেই হোন না কেন— যখন দেখবেন কল-টাইমের পনেরো মিনিট আগেই আপনার পরিচালক এসে উপস্থিত হচ্ছেন রোজই তখন পরিচালকের কমিটমেন্ট নিয়ে আপনি নিশ্চিত হবেনই। আপনার মনে হবে, কোনো কারণেই আপনি নিজে দেরী করে আসতে পারেন না। কল-টাইম দশটা মানে সবারই দশটার মধ্যেই উপস্থিত হওয়া, দুপুর ১-টায় লাঞ্চ মানে ১-টাতে ‘লাঞ্চ ব্রেক’ আর ৬-টায় শিফট শেষ মানে ডট ৬-টাতেই কিংবা তার আধঘণ্টা আগেই প্যাক-আপ— তপন সিংহ-র শুটিং মানে এরকমই। বিখ্যাত মেক-আপ ম্যান সত্তরোর্ধ শক্তি সেনকে দেখেছি প্রতিদিনই কল-টাইমের ১৫ বা ২০ মিনিট

আগে এসে মেক-আপ রূমে বসে থাকতে, বলাই সেনকে দেখতাম আগে চলে এসে স্ক্রিপ্ট নিয়ে নাড়াচাড়া করতে, তপন সিংহ-র বহুদিনের সঙ্গী স্টিল ফোটোগ্রাফার সুকুমার রায়কেও দেখেছি আগে চলে আসতে। তপন সিংহ-র ইউনিটে চল্লিশ বছর ধরে কাজ করা বৃদ্ধ 'প্রোডাকশন বয়' গৌরদা আধঘন্টা আগে এসে অফিস ঘর খুলতেন। ক্যামেরাম্যান সৌম্যেন্দু রায় এবং তাঁর সহযোগী পূর্ণেন্দু বসুও আগেই চলে আসতেন। আর প্রধান ইলেকট্রিশিয়ান বাবলুও চলে আসতো ওই সময়েই। বাঙালীর তথাকথিত সময়জ্ঞানহীনতা এবং অলসতার ছোঁয়া তপন সিংহ-র ইউনিটে ছিলো না। নব্বই-এর শুরুর দিকের ওই সময়ে টালিগঞ্জ স্টুডিও পাড়ায় তখন ঢুকে পড়েছে সিরিয়াল, মেগা সিরিয়ালের তোড়— কমিটমেন্ট, পারফেকশন, নিয়ামানুবর্তিতা-টালিগঞ্জ ফিল্ম সংস্কৃতির আদি এইসব অনুসঙ্গ আর ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়— তখন। এমনি সময়ে দাঁড়িয়েও পরিচালক তপন সিংহ তাঁর অনায়াস নিয়মানুবর্তিতা, কমিটমেন্ট, উপস্থিতি এবং ভালো-কাজ-করার-ইচ্ছা দিয়ে ইউনিটকে অনুপ্রাণিত করতেন। পুরনো কিন্তু ঋজু বৃক্ষের মতোই ছিল তাঁর উপস্থিতি, তাঁর ছায়া। আমরা যারা ওঁর সাথে কাজ করতাম, গর্বিত হোতাম ওই ছায়ার নীচে থাকতে পারায়। উপভোগ করতাম আমাদের ইউনিটের প্রতি পুরো ইন্ডাস্ট্রির সশ্রদ্ধ দৃষ্টি। তপন সিংহ-র সাথে কাজ করে— তাঁর স্ক্রিপ্ট পড়ে, তাকে শুটিং করতে দেখে, এডিটিং করতে দেখে, তাঁর সাথে আলোচনা করে, তাঁর ছবি দেখে— চলচ্চিত্র নির্মাণের অনেক কিছুই বুঝতে, শিখতে পেরেছি। একইসময়ে এই সত্যও বুঝেছি যে চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রক্রিয়ায় পরিচালকের ম্যানেজমেন্ট দক্ষতাও আসলে তার কাঙ্ক্ষিত সৃজনশীলতার রূপায়ণেরই এক অতি জরুরী উপাদান।